গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাস-ত্রয়ী:
বাঙালি মুসলিম সমাজের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ সন্ধান

আমিনুল ইসলাম

গৌরকিশোর ঘোষ (১৯২৩-২০০১) এক ব্যতিক্রমী ঔপন্যাসিক। তিনি তাঁর উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ধারাবাহিকতার উপর যে নির্মোহ আলো ফেলেছেন, বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সে দৃষ্টান্ত বিরল। এমনকি ভারতীয় উপন্যাস সাহিত্যেও। তিনি 'দেশমাটি ও মানুষ' নামের এপিক ট্রিলজিতে ধরতে চেয়েছিলেন বাঙালি মুসলমানের আত্মানুসন্ধানের স্বরূপ। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানের ক্রমবিচ্ছিন্নতার ইতিবৃত্ত।

ট্রিলজির প্রথম উপন্যাস 'জল পড়ে পাতা নড়ে' (১৯৭৮)। ১৯২২-১৯২৬ সাল এই উপন্যাসের কালপর্ব। দুটি খণ্ডে বিন্যস্ত এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের নাম—'দুরন্ত ধারা'। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'হাওয়া এলোমেলো'। কাহিনির আরম্ভ একটি লোক-গল্প দিয়ে। সুন্দরী বেশে ওলাইচণ্ডীকে ঘরে ডেকে এনে উজার হয়ে গেল কুড়োনোর মার পরিবার। তারপর গেল গ্রামখানা। তারপর আঠারো খাদ, 'বিনেদপুর, ধপধপি, কুড়োল নমসি...', একে একে সব গ্রাম। নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ সমাজ। বংশ পরম্পরা হিন্দু-মুসলিমের পাশাপাশি বসবাস। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মেজোকর্তা। কলকাতায় পড়াশুনা করেছেন। দেখেছেন জ্ঞানী সংস্কারমুক্ত অধ্যাপকদের। প্রবীন চাকুরে মেজোকর্তা গ্রামে বসবাস করছেন। সংস্কারমুক্ত এই মানুষটি মনেপ্রাণে অসাম্প্রদায়িক। কলকাতার চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর স্বরাজ্য পার্টির মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের মধ্যে দিয়ে যে দুই সম্প্রদায়ের মিলনের চেষ্টা করেছেন, তিনি তাকে সমর্থন করেন। রাজনৈতিক সমাধানের চেয়ে তিনি গরীব কৃষকের অর্থনৈতিক সমাধানের উপর বেশি জোর দিতে চান।

অসাম্প্রদায়িক মেজোকর্তার বিরুদ্ধেও অভিযোগ ওঠে যে, তিনি মুসলমানদের সমর্থন করেছেন। অন্যায় না করেও ছোলেমানকে জনসমক্ষে শাস্তি স্বরূপ জুতোর বাড়ি খেতে হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে জোরদার করার জন্য যে সমাধান সূত্র মেলে তা আসলে দুই প্রতিবেশীকে বিচ্ছিন্ন করে। হিন্দুর জন্য হিন্দু ভোট, মুসলমানদের জন্য মুসলিম ভোট, আবার হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, এটা ভোটের ভাঁওতা। মেজোকর্তা চান সকলেব জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে। সকলের জন্য জনসংখ্যার সমানুপাতে চাকরি নয়, সকলের জন্য অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা। শিক্ষিত

মুসলমানের মনে চরম হতাশা, তা থেকে জন্ম নেয় ক্ষোভ। শিক্ষিত সফীক জানায়, 'সুজা রাস্তায় আপনাদের নাগাল ধরতি আমাগের দুটি তিনটি জন্ম কাবার হয়ে যাবে। তা তদ্দিনের এন্তেজারে কি কেউ থাকতে চায়?' শিক্ষিত মুসলিম তাই প্রয়োজনে বাঁকা রাস্তায়ই যাবে। মেজোকর্তা গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সে স্কুল কমিটিতে হিন্দু মুসলমান এমনকি বর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষও থাকবেন। হিন্দু মুসলমান কেউই এতে রাজি নয়। মেজকর্তার স্কুল সরকারি অনুমোদনও পেল না। তবে পরে তার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে প্রতিষ্ঠিত হল 'মোছলেম মিডল মাদ্রাসা' এবং তা সরকারি অনুমোদনও পেল।

এই উপন্যাসে পারিবারিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক জীবনের অন্তর্লীন আলোড়নকে যুক্ত করে দিয়েছেন লেখক। রাজনীতির অঙ্গুলি হেলনে চলছে শহর থেকে দূরের এই গ্রাম জীবন।

কলকাতায় শুরু হয়েছে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। গ্রাম থেকে কলকাতায় যাওয়ার পথে মেজোকর্তা পেলেন চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু সংবাদ। দার্জিলিং মেলে কলকাতায় চলছে তাঁর শবদেহ। সমাপ্তি ঘটছে একটি পর্বের। সমাপ্তি ঘটল হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের ঐক্য প্রচেষ্টারও।

সপ্তদশ শতকে সৈয়দ আলাওল যেমন সতী ময়নার কাহিনী লিখেছিলেন, তেমনই বিশ শতকেও রচিত হল এক উল্টো দৃষ্টান্ত। লেখক গৌরকিশোর ঘোষ লিখলেন, গ্রামীণ মুসলমান জীবনের এক এপিক আখ্যান 'প্রেম নেই' (১৯৮১)। ট্রিলজির এই দ্বিতীয় উপন্যাসে মুসলমান-জীবনের আলোছায়া আর হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বর্ণিত হয়েছে এক বিস্তারিত পটভূমিতে। সাম্প্রদায়িক সমস্যার নানা কারণাকারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে উপন্যাসে।

গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই' মুসলিম সমাজ-চিত্রের উপর একখানি অসাধারণ উপন্যাস। দেশ স্বাধীন হবার পর মুসলিম সমাজ-জীবনের উপর এমন একটা গ্রহণযোগ্য উপন্যাস এখনও পর্যন্ত রচিত হয়নি বললেই হয়। উপন্যাসটি পূর্ব-বাংলার পটভূমিকায় লেখা হলেও সামগ্রিকভাবে মুসলমান সমাজকেই লেখক ফালা ফালা করে দেখিয়েছেন। লেখক মুসলমানদের অন্তঃপুরে নির্বিকারে প্রবেশ করেছেন।

ঋণ স্বীকারের পাতায় লেখক বলেছেন—"বোন ফিরদৌসী ও তাঁর স্বামী নূর মুহম্মদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে মুসলিম জীবনযাত্রার অনেক খুঁটিনাটি দিক বোঝা আমার পক্ষে অনেক সহজ হয়েছে।"

মুসলমান সমাজের ভিতর প্রবেশ করতে না পারলে ইসলামিক কায়দা কানুনের রেখাচিত্রগুলো এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা কখনও সম্ভব নয়। এই উপন্যাসে

লেখক শুধু মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশাসনের কথাই বলেননি, তাদের গার্হস্থ্য জীবনের চলন বলনে ও কর্মের উপর ইসলামিক আদব কায়দা, কানুনের রেখাচিত্রগুলো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। দূর থেকে দাঁড়িয়ে বা কারও মুখে শুনে এমন সজীব চিত্র অঙ্কন কখনও সম্ভব নয়। এমনকি লেখক মুসলমানের শয্যাকক্ষেও প্রবেশ করেছেন। স্বামী-স্ত্রী (ফটিক ও বিলকীসের) কথোপকথনে লেখকের উপস্থিতি বিস্ময়কর।

মুসলিম সমাজ নিয়ে এ উপন্যাস রচিত হলেও মুসলমানদের পাশাপাশি অসংখ্য হিন্দু চরিত্রও আছে। উভয় সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বাসবাসের ফলে, উভয়ে উভয়ের সুখ দুঃখের সঙ্গী। শুধু কি তাই, ধর্ম ও সমাজ নিয়ে উভয় জাতির মধ্যে নীচতা, শঠতা, লোভ, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সমাজ বিধ্বংসীর চিত্রগুলি এক একটি মালা গাঁথার মত তুলে ধরেছেন। এ উপন্যাসের সম্প্রীতির চিত্রগুলো বড় মধুর। গল্পের নায়ক ফটিক খুব গরীব ঘরের ছেলে। এক টানে লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে মাস্টারীও করতে হয়েছে তাকে। ফটিকের ছাত্র ও মাস্টারী-জীবনের নানা স্মৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গক্রমে করেছেন লেখক।

উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কটি লেখক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চেয়েছেন। দাঙ্গার পর দাঙ্গা এবং সাম্প্রদায়িক প্রীতি-অপ্রীতি লেখককে উদ্‌বেলিত করেছে, নিজেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন, কিছু কাজেও নিজেকে যুক্ত করেছিলেন গৌরকিশোর। তার অভিজ্ঞতা শেষ পর্যন্ত একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়েছিল বলে মনে হয়। সেই কারণেই 'প্রেম নেই' উপন্যাসের পটে তিনি একটা বড় অঞ্চলকে নিয়ে চিত্রিত করেছেন। বাংলাদেশের এই পট সমগ্র বাংলার নির্যাতিত মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না এরকম একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। একটু খুলে বলি, তারাশঙ্কর বীরভূমের কাহিনী রচনা করেছিলেন। সেখানকার কৃষক মজুর বিশেষ করে কৃষকের অবস্থা সম্পর্কে তারাশঙ্করের জরিপ আর গৌরকিশোরের অভিজ্ঞতা এক নাও হতে পারে। কারণ লেখক দু'জন—দুইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হতে পারে। দ্বিতীয়, পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে হিন্দু কৃষকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে মুসলমান কৃষকের প্রাধান্য সংখ্যার দিক থেকে। তৃতীয়ত, পূর্ববঙ্গে জমিদার অধিকাংশ হিন্দু আর প্রজা মুসলমান। সুতরাং গৌরকিশোরকে এই মুসলমান মানসিকতা বুঝতে হয়েছে। তাদের জীবন মরণের সঙ্গী হতে হয়েছে। গৌরকিশোরকে একেবারে গুন্টার গ্রাসের মতোই মুসলমান-পল্লিতে বাস করতে হয়েছে। সমরেশের মতোই ('টানা পোড়েন') তাঁতিপাড়ায় ঘুরতে হয়েছে। গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে নিজেও নৌকা চালিয়েছেন। গৌরকিশোর সাম্প্রাদায়িক বাধা অতিক্রম করেছেন। প্রচুর পড়েছেন। তবে যত না পড়েছেন তার চাইতে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন বেশি। কখনও কখনও মনে হয় একটু বেশি মাত্রাতেই ইসলামের ধর্ম, সদাচার, নীতির

উৎস সন্ধান করেছেন। মানুষগুলির জীবনযাপনে এই ইসলামি নিয়ন্ত্রণ কীভাবে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে তার সন্ধান করেছেন, গৌরকিশোর। তেলওয়াত, নসিহত, কোরানের হাদিসের নিবিড় পরিচয়ের উজ্জ্বল দীপ্তিতে উপন্যাসটি উদ্ভাসিত। আবার ওই ধর্মের মধ্যেই কোথাও ফাঁকফোকর থেকে গেছে কি না গৌরকিশোরের সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। হিন্দুধর্মে যেমন সংস্কারকরা বুঝেছিলেন শাস্ত্রের চাইতে লোকাচারের দাপট বেশি তেমনই শিক্ষিত মুসলমানের মধ্যেও এই চেতনা ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিল। গৌরকিশোর উপন্যাস লেখার সময় যে কালকে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় পেয়েছিলেন সেই দৃষ্টি দিয়েই মুসলমান সমাজকে দেখেছেন, হিন্দু-মুসলিম যৌথ রাজনীতির স্বরূপের সন্ধানও এই উপন্যাসে লক্ষ করবার বিষয়। অন্যদিকে, ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের মুসলমান মুক্তিযুদ্ধের পর যে স্তরে এসে পৌঁছেছে সেই স্তরে তারা আপন সমাজের আত্ম আবিষ্কার এবং তার প্রতিষ্ঠায় নিয়ত সংগ্রামে রত। গৌরকিশোর এই সমস্যাটিকেও ছুঁয়েছেন।

উপনিবেশের দাক্ষিণ্যে যে বাঙালি জাত সমগ্র বাংলাদেশে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার যে উন্নতি প্রগতির কথা আমরা বলি তা অনেকাংশেই ভুল ব্যাখ্যা ভুল বিশ্লেষণ যতটা না, তার চাইতে বেশি সংখ্যাতাত্ত্বিক ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়া। গোপাল হালদার তাঁর সংস্কৃতির রূপান্তরের বিশ্লেষণে বলেছেন উন্নতি-প্রগতি-শিক্ষা-সংস্কার উনিশ শতকে যতটা হয়েছিল তা শতকরা এক শতাংশ। বাকি ৯৯ শতাংশই সেই টোল মাদ্রাসা নিয়ে ছিল। এই এক শতাংশ চুঁইয়ে হয়ত দশ শতাংশে পৌঁছেছিল কিন্তু তার বেশি নয়। আবার এই অন্ধকারের নিরানব্বই জনের মধ্যে মুসলমানই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। গৌরকিশোর এই পটটিকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। এবং দেশবিভাগের রাজনৈতিক পরিণতির কারণগুলি একের পর এক তুলে এনেছেন তিনি তাঁর উপন্যাসে। ঐতিহাসিক যেমন ইতিহাসের সঙ্কটময় মুহূর্তের সব কারণগুলিই তন্ন তন্ন করে খোঁজেন গৌরকিশোরও সেই পথই অবলম্বন করেছেন। সেই ভাষাকেই তিনি অধিকাংশ চরিত্রের মুখে দিয়েছেন।

উপন্যাসটিকে তিনটি পর্বে সাজিয়েছেন গৌরকিশোর। 'আওরাতে হাসিনা' (সুন্দরী মহিলা), '.... মধ্যিখানে চর', '.... কালবৈশাখী'। আমরা বলতে পারি প্রথম পর্বটি অল্পবিস্তর পারিবারিক। বিশেষ করে হাজি সাহেব এবং তার মেয়ে ছবি বা বিলকিস, স্ত্রী নয়মোন এবং শাফিকুল, তার বাবা সাজ্জাদ এবং শফিকুলের মায়ের কাহিনী। হাজি সাহেবের আত্মীয়স্বজন এই কাহিনীতে স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে নয়মোনের বোন ফুটকির জীবনযাপনের বিস্তৃতি অনেকটা। ফুটকির স্বামী দাউদের উচ্ছৃংখল জীবনকে লেখক বেশ গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

এই পর্বেই গৌরকিশোর মুসলমান সমাজের পারিবারিক জীবনের করুণ মধুর

দিকটি সবিস্তারে উত্থাপন করেছেন। ডকুমেন্টেশন এই পর্বেই বেশি মনোযোগ পেয়েছে। এই সমাজের গড়নকে ধরতে চাইছেন লেখক। গড়নের খুঁটিনাটিও যাতে বাদ না পড়ে সেদিকে ঔপন্যাসিক সজাগ। ছবির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে শফিকুলের। দুটি পরিবারের আর্থিক সাচ্ছল্যের ব্যবধান মেরুপ্রতিম। তবু হাজি সাহেব মেয়েকে শফিকুলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন শফিকুলের শিক্ষার দিকে তাকিয়েই। আর ছবি তার ছেলেবেলা এবং কৈশোর যে শিক্ষা, যে রুচি, যে ধর্মীয় বাতাবরণে যাপন করেছে তাকে ঘিরেই লেখক তার তথ্যচিত্র রচনা করেছেন। সুন্দরী মহিলা অর্থে ফর্সা দেহের গঠন ইত্যাদি বোঝাচ্ছে না, নারীর চরিত্রের যে আন্তরসৌন্দর্য সেটিই আওরাতে মহিলা-র মর্ম। আরও মনে হয় যে সমাজ সম্বন্ধে পুরুষরা ওয়াকিবহাল, তাদের সামনেই লেখক তুলে ধরতে চাইছেন শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত মহিলার জীবনকথা। পিতৃতন্ত্রের প্রতাপ আর নারী নির্যাতন একই সঙ্গে এই উপন্যাসে উঠে আসে। এই পিতৃতন্ত্রের উৎস সন্ধানে গৌরকিশোরের যাত্রা।

আমরা জানি, অবিভক্ত বাংলার গ্রামজীবন হিন্দু-মুসলমানের আন্তরিক সম্পর্কে গ্রথিত ছিল। 'প্রেম নেই' উপন্যাসে বিশ্বাস বাড়ির ছোট মেয়ে টগর আর হাজি সাহেবের মেয়ে বিলকিস একে অন্যের 'গোলাপ ফুল' পাতায়। টগর সুগন্ধি সাবান নিজের হাতেই ঘষে দেয় বিলকিসের চুলে, নদীর ঘাটে দুই সখির বাক্যালাপ চলে। লেখক দুই যুবতীর সংলাপের মাধ্যমে সমান্তরাল দুটি সম্প্রদায়ের বিপরীত অবস্থান স্পষ্ট করে দেন।

টগর আর বিলকিস স্বচ্ছ জলে অবগাহন করে একে অন্যের প্রতি অকৃত্রিম আগ্রহ, আন্তরিকতা যতই স্পষ্ট করুক—সমাজ সেই জলপ্রবাহেও অস্পৃশ্যতার গন্ডি এঁকে দেয় ধর্মের নামে। টগরকে ঘড়া থেকে ফেলে দিতে হয় পুজোর জল, কেননা সে-জল বিলকিস ছুঁয়েছে। এখান থেকেই তৈরি হয় দুই সম্প্রদায়ের যে বিভেদ, তা আমরা বারবার দেখেছি। গৌরকিশোর লিখছেন, 'টগর কাঁখ থেকেই ঘড়া উপুড় করে ঘড়ার জল ফেলে দিতে লাগল। বিলকিস করুণ চোখে দেখতে লাগল টগরের ঘড়ার জল গড়গড় করে গড়িয়ে এসে ওদের দুজনের মাঝখানে কেমন মোটা একটা দাগ কেটে নদীর দিকেই নেমে যাচ্ছে।'

এই অস্পৃশ্যতার চিহ্ন আমরা এই উপন্যাসের অন্যত্রও দেখেছি। মুসলমান-কিশোর ফটিক তারিণী মাস্টারের বাড়িতে পড়তে গিয়ে এই অস্পৃশ্যতার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু তারিণী মাস্টারের স্ত্রী তাকে অন্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখিও করেছে : ''ফটিকের মনে হল এই বোধহয় দেবী সরস্বতী। মানুষের এমন চেহারা সে দেখেনি। তিনি হেসে স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, 'ওঁর কথা তো অ্যাতক্ষণ ধরে খালে বাবা, ইবার নাও আমার হাতের মোয়া।"

ফটিকের এই প্রাপ্তি খুব সাধারণ ঘটনা নয়, তার এই অভিজ্ঞতা অনেকটাই ব্যতিক্রমী। হয়তো সে-জন্যেই "শরিয়তি মোল্লারা যা-ই বলুন, তারিণী স্যারকে সে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।" তবু কর্মজীবনে ফটিককে সেই অস্পৃশ্যতার অভিজ্ঞতা পেতে হয়েছে বারবার। দারেপুর সিভিল স্কুলের পণ্ডিতমশাই রামানন্দ পন্ডিত হিন্দুত্বের অহঙ্কারে ফটিকের-বসা চেয়ারে গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিয়ে নিজে বসেছিলেন, ছাত্রদের জিভ গোবর দিয়ে ধুতে বলেছিলেন, আর ফটিককে সরাসরি বলেছিলেন: "তুমি হচ্ছে যবন আর ধনা হচ্ছে চাঁড়াল। তুমরা দুটোই অস্পৃশ্য। তুমরা যতক্ষণ ঘরে ততক্ষণ জলস্পর্শ করি কী করে? গায়ে বামুনের রক্ত আছে যে, ধম্মটা বজায় রাখতি হবে তো?"

অথচ এই রামানন্দ পণ্ডিত, পরবর্তী সময়ে ফটিক যখন বিদ্যালয়ের অস্থায়ী প্রধানশিক্ষকের দায়িত্ব পায় তখন নিজের স্বার্থ-হাসিলের জন্য ফটিককে তোষামোদ করেন একেবারে বিপরীত ভাষায় : "মুসলমান বলে তোমার সামনে জল খালি জাত যাবে! মুসলমান কথাটার মানে জানো? মুশল + ম্যান ইতি মুশলম্যান। ম্যান মানে মানুষ অর্থাৎ কিনা যে সকল মানুষ মুশল হইতে উৎপত্তি তারাই হল মুশলম্যান বা মুসলমান। বুঝিছ? এ হল গিয়ে স্বয়ং ব্যাসদেবের মহাভারতের কথা। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব মুশল প্রসব করিছিল। জান তো? সেই মুশলের থে জন্ম যাদের তারাই হল গে মুশলমান। তুমরা হলে গে আসলে ভগ্ন যাদব। অর্থাৎ কিনা যদুবংশের তিলক সব। তুমরা তো আমাগো পর নও বাবা। তুমার সামনে জল খালি জাত যাবে ক্যান।"

একদিকে যেমন এই রামানন্দ পণ্ডিত অন্য দিকে রয়েছেন মৌলানা দ্বীন মোহাম্মদ দৌলতপুরীর মতো মৌলবিরা। এঁরাই নিজেদের স্বার্থপূরণের তাগিতে সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের স্বাভাবিক মিলন-প্রবণতার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছেন বারেবারে। 'প্রেম নেই' উপন্যাসে মোল্লা মৌলবিদের শিক্ষায় প্রভাবিত জমিরুদ্দি বলে : 'অতশত জানি নে। মৌলানা দ্বীন মোহাম্মদ দৌলতপুরীর মুখির থে শুনিছে যে, হিঁদুদিগের সঙ্গে মুছলমানদিগের মিশ খাওয়া সম্ভব না। ক্যান? না তার পেরধান কারণ এই যে ইরা দুটো আলাদা জাত। হিন্দুরা পয়দা হইছে হিন্দুস্থানে মুছলমানরা পয়দা হইছে আরবে। আমাদিগের মুছলমানদিগের আসল দেশ হল আরব দেশ।"

এই মোল্লাতন্ত্র আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুব-সমাজকে নিজেদের বিপদের কারণ বলে বুঝতে পেরেছে। মৌলবি দৌলতপুরী সে-কারণেই বলে : "এরা আরও সাংঘাতিক। এরা কোরান পড়েছে এবং ইংরেজী পড়েছে। এরা তফসীর মানতে চায় না। বলে কি, পুরাতন তফসীর লেখকেরা শত শত গালগল্প, অযৌক্তিক মতবাদ নিজেদের তফসীরে ঢুকিয়ে রেখে গেছেন। এজমা, কিয়াস, ফেকা সম্পর্কে বলে,

ওগুলো আল্লাহের বাণী নয়। রসুলেরও কোন বাণী নয়। ফেকা একজন ইমামের ব্যক্তিগত মত মাত্র আর এজমা কিছু সংখ্যক মোল্লা মৌলবীর সমবেত সিদ্ধান্ত। এজমা কিয়াস ফেকার শাস্ত্র নিয়ে মুসলমানে মুসলমানে মজহবী লড়াই নাকি মোল্লা মৌলবীরাই জিইয়ে রেখেছে।"

গৌরকিশোর বাবুকে ধন্যবাদ । তিনি মুসলমানদের মর্মমূলে হাত দিয়েছেন। সত্যিই তো দ্বীন মোহাম্মদের মত মৌলবি সাহেবদের হাত থেকে সমাজকে বাঁচাতে না পারলে মোটেই সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়।

"মৌলভী আবু তালিব বঙ্গের মুসলমানদের জাগ্রত করার জন্যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিস্‌মিল্লা, হিররহমানির রহীম পরম দাতা দয়ালু আল্লার নামে আরম্ভ করছি ... তিনি শুরু করলেন। ... বঙ্গের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা আল্লাহ্ পাকের পেয়ারা বান্দা। আজ তোমাদের অবস্থা এত হীন কেন। তোমাদের উন্নতি নাই কেন?

... তাবু তালিব সাহেব কিছু সত্য স্বীকার করেছেন—হিন্দুদের অধ্যবসায়, স্বজনপ্রীতি গুণাবলী আমাদের অনুকরণীয়।

.... আলাহ্‌পাক আমাদের নিয়ম মকসুদ পূর্ণ করুন। ....মার্‌হাবা, মার্‌হাবা... ।" মজলিশের ভিতরে প্রবেশ না করে কারো কাছে শুনে এসব কথা লেখা যায় না। যে সব লেখকরা বলেন মুসলমান সমাজ সম্পর্কে আমাদের জানা নেই, তাঁদের জানা উচিত, গৌরকিশোর ঘোষ মুসলমান সমাজের মানুষ নন, তিনি কীভাবে মুসলমান সমাজের এত গভীরে প্রবেশ করতে পারলেন? একটা সমাজকে জানার ইচ্ছে থাকলে সব কিছু সম্ভব। তিনি শুধু ধর্মীয় গোঁড়ামী, ভণ্ডামীর দিকটাই তুলে ধরেননি। মুসলিম দাম্পত্য জীবনের অজস্র মণিমুক্তা আহরণ করে ফুলের মত যেভাবে সাজিয়েছেন, বহু মুসলমান লেখকদের পক্ষ এ কাজ সম্ভব নয়।

নায়ক ফটিক একজন উকিল। তাঁর স্ত্রী হাজি সাবের কন্যা—ছবির প্রথম বাচ্চা আছাড় খেয়ে পেটেই নষ্ট হয়ে গেছে। মুসলমান পরিবারের এই দুর্ঘটনা এক বিস্ময়কর পরিবেশের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করছেন লেখক—

"—আমরা তো বহুদিন আল্লার রাস্তা ছাড়িনি বাপ। আমাগোর নছিবিই শুধু আল্লাতালার গজব...।

—ফটিক বলল, মা, চুপ কর। খবর শুনে হাজী সাহেব ছুটে এল। হাজী সাহেব প্রভাবশালী মানুষ। তাঁর পিছু পিছু এল দুজন ডাক্তার। নির্মল ডাক্তার এবং দুর্গা ডাক্তার। দুজনেই ছবিকে হাসপাতালে পাঠানোর সৎ পরামর্শ দিলেন। সেই ব্যবস্থাও করা হল। দুর্গা ডাক্তার ফটিককে বললেন—এ নষ্ট হবেই। ফটিকের কাঁধে হাত রেখে অন্তরঙ্গ হলেন, ধীর কণ্ঠে বললেন—আমাদের প্রথম চেষ্টাই হবে জননীকে রক্ষা করা।"

উপন্যাসে সম্প্রীতি আছে। দলাদলি আছে। প্রেম ভালবাসা আছে। সব কিছু মিলিয়ে এক অনবদ্য পরিবেশ পরিবেশন করেছেন গৌর কিশোর বাবু। উনি যা করেছেন, এখনও পর্যন্ত তা বিরল।

এছাড়া উপন্যাসের অনেকখানি জুড়ে আছে সাজ্জাদ বশিরদের মত গরিব চাষীর দুর্দশা আর তাদের বাঁচার লড়াইয়ের কাহিনী। কাহিনীর বিস্তার পর্বে দেখা যায় ধীরে ধীরে এদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটেছে। এরা সংঘবদ্ধ হচ্ছে কৃষক প্রজা পার্টির ছত্রছায়ায়। এইসব গরিব চাষীর স্বার্থে কৃষক প্রজা পার্টির সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী আছে। জমিদার-মহাজনদের শোষণ থেকে প্রজা-ঘাতকদের বাঁচানোর জন্য তারা বদ্ধপরিকর। এই ধরনের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ধার কাছ দিয়েও যায় না রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর জমিদার শ্রেণীর মুসলমানদের পার্টি মুসলিম লীগ। তারা শুধু মুসলমানদের সার্বিক ঐক্যের শ্লোগান দেয়। কিসের জন্য ঐক্য তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। দাবি কেবল দুটি, মসজিদের সামনে বাজনা বাজান চলবে না আর কোরবাণীতে গরু জবাইয়ের অধিকার দিতে হবে। বাকি সবই নিজেদের পাতে ঝোল টানার দাবি। যেমন পৃথক নির্বাচন, আসন সংরক্ষণ ইত্যাদি। এইসব দাবি আদায়ের দ্বারা আর যাই হোক গরীব চাষী-মজুর শ্রেণীর মুসলমানদের যে বিশেষ কিছুই উপকার হবে না সে কথা বুঝতে সাজ্জাদ-বশিরদের কোনও অসুবিধা হয় না। তাই তারা উঠে পড়ে লাগে কৃষক প্রজা পার্টির সংগঠন মজবুত করার কাজে। যাতে তাদের প্রার্থী আবু তালেব ভোটে জিতে বেরিয়ে আসে। কিন্তু তাদের সেই আশা শেষ পর্যন্ত ফলবতী হয় না। টাকার জোরে আর ধর্মীয় জিগিরকে কাজে লাগিয়ে আখেরে খানবাহাদুর খোনকারই জিতে যায়।

'প্রেম নেই'—এর কাহিনীতে সাজ্জাদ মোল্লার চরিত্র যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তা গ্রামবাংলার দরিদ্র মুসলমান চাষীজীবন নিয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। গাঁয়ে গাঁয়ে যে দরিদ্র চাষী লাঙল হাতে চাষ করে বেড়ায়, গায়ে গতরে খেটে ফসল ফলায়, তাদের মধ্যেও যে এমন ব্যক্তিত্ব থাকতে পারেন যিনি কেবল নিজের চরিত্রগুণে আশপাশের পাঁচ-সাতটা গাঁয়ের একজন সম্মানিত মাতব্বর বলে গণ্য হতে পারেন। এমন একটা সামাজিক বাস্তবতা লক্ষ্য করা শুধু নয়, সাজ্জাদ মোল্লার ভিতর দিয়ে এমন একটা চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে লেখক যে শক্তিমত্তাব পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অসাধারণ। কায়িক শ্রমের প্রতি অবজ্ঞার দৃঢ়মূল সংস্কারে আচ্ছন্ন বিশেষ করে বর্ণহিন্দু সমাজে কারও পক্ষে সাজ্জাদ মোল্লার মর্যাদা অনুধাবন করাই একটা দুর্লভ ঘটনা। বর্ণহিন্দু সমাজ থেকে উদ্ভূত নেতারাও কজন সাজ্জাদ মোল্লার মত ব্যক্তির মর্যাদামন্ডিত অস্তিত্ব এ যাবৎ অনুধাবন করতে পেরেছেন সেটাই একটা তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার। হামেশাই লক্ষ্য করা যায় সাজ্জাদ

মোল্লাদের ঘরের বুদ্ধিমান ছেলেরা উল্লেখিত নেতাদের অবজ্ঞামিশ্রিত আচরণে পদে পদে আহত হতে হতে শেষ পর্যন্ত কথাকথিত প্রগতিশীল রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে, এমনকি কেউ কেউ প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরে যোগ দেবে এমনটা ঘটাই তা স্বাভাবিক। 'প্রেম নেই'-এর শফিকুল যে উত্তুঙ্গ আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী হয়েছিল সাজ্জাদ মোল্লার ঘরে না জন্মালে তা কি সম্ভব হত? কথাটা কজন তথাকথিত জনদরদী বর্ণহিন্দু নেতা বোঝেন?

'কোরক' পত্রিকায় (শারদ ১৪০০) 'প্রেম নেই' প্রসঙ্গে গৌরকিশোর বলেছেন, "সময়কাল অতিবাহিত হলেই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই পরিবর্তন হচ্ছে না, এ প্রশ্ন তোলার অর্থ পরিবর্তিত অবস্থাটা প্রশ্নকর্তার চোখে ধরা পড়ছে না। ... বলা হয়ে থাকে, আগে .... একসঙ্গে সুখদুঃখের গল্প হত, তখন নাকি সহাবস্থান ছিল। আসলে এটা হল সেই মনোভাব যা শেখায়, যাকে যে অবস্থায় রাখতে চাইছি, তার সেখানে থাকাটাই যুক্তিযুক্ত। সংখ্যালঘুদের মনোভাবেও যে পরিবর্তন ঘটছে সেই বিষয়টা সুপিরিয়র কমিউনিটির দৃষ্টিবাহির্ভূত থেকে যাচ্ছে। সেই পারিস্থিতিতে সংখ্যালঘুর ভাবনাকে গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছে না। তাই পাশাপাশি বাস করেও থেকে যাচ্ছে সু-দুস্তর ব্যবধান। ...এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার দূরত্ব আরো বেড়েছে। অবিশ্বাস ছাড়া ভাল অবস্থা বিশেষ কিছু দেখিনি।"

তাছাড়া নিজের সম্প্রদায়ের দিক থেকেও ফটিকের সমস্যার অন্ত ছিল না। আইডেন্টিটির নামে যারা নিজেদের মুসলমানত্ব জাহির করে বেড়ায় তাদের প্রতি প্রসন্ন হতে পারে নি সে, তার কারণ, "সে কতখানি মুসলমান, তার পরীক্ষা কারও কাছেই দিতে রাজি নয় ফটিক। এ তার বিবেকের প্রতিবাদ। ধর্মের বাটখারায় মানুষকে মাপার ওজন সব সময় নির্ভুল থাকে, এ বিশ্বাস নেই ফটিকের। তার নিরিখে সে মনুষ্যত্বের ওজনেই ধার্য করতে চায়। তাই যখনই মুসলমানত্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠে উগ্রস্তরে তার কাছে শর্তহীন আনুগত্য দাবি করতে থাকে, তার মনুষ্যত্বকে সামূহিকতার প্রবল চাপে নিষ্পেষিত করতে উদ্যত হয়ে ওঠে, সে তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বা সমূহের কাছে তার বিবেক বশ্যতা স্বীকার করতে চায় না। এ তার যন্ত্রণা। কিন্তু তার আরও বড় যন্ত্রণা এই যে সে বিদ্রোহ করতেও ইতস্তত করে। ভয় পায়। কারণ তাহলে সে যাবে কোথায়? কোথায় সে আশ্রয় পাবে? মুসলমান তাকে সন্দেহ করবে হিন্দুর চর বলে আর হিন্দু তাকে নিধন করতে দ্বিধা করবে না তার নামটা মুসলমানী বলে। তার ধর্ম ইসলাম বলে।" এ যেন আজকের ফটিকদের তথা মুসলিমদেরও আত্মদর্শন। ১৯৩৫ থেকে ২০০৮ এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান সমাজের ফটিকরা যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। "আজও যুক্তিপরায়ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী

ফটিকের উত্তরসূরিরা এই বাংলায় তার অসহায় একাকিত্বের যন্ত্রণারও উত্তরাধিকার বহন করে দিন কাটায়।"

গৌরকিশোরের মতো ক'জন আর কোরান-হাদিসের কথা অত সঠিকভাবে জানেন? যাঁদের ঐতিহাসিক দৃষ্টি আছে, যাঁরা উপলব্ধি করেছেন দেশবিভাগের নেপথ্যে রাজনৈতিক চক্রান্ত আছে, কিংবা দেশ ছেড়ে এসে ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতিচারণ যাঁরা করতে চেয়েছেন, তাঁদের উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে হয়ত মুসলিম সমাজ ও চরিত্র উঁকি দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ লেখা সংখ্যায় অতি নগণ্য। পল্লীজীবন, ঐতিহাসিক চরিত্র বা নিম্নশ্রেণীর মানুষ নিয়ে মুসলমান সমাজ নানান সময়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সাধারণত প্রেম বিরহ-মিলন নিয়ে, সংঘাত সমস্যা নিয়ে শহরের মধ্যবিত্ত মানুষ, সব উপন্যাসে যে জায়গা পেয়ে থাকেন, প্রায় কোনও লেখকই ভদ্র ও শিক্ষিত মুসলমানদের জীবন নিয়ে লেখেন না। হিন্দু সমাজ প্রতিবেশী হয়েও মুসলমান সমাজের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। ভাই গিরিশচন্দ্রের কথা কে না জানে? মনে হয়েছে গৌরকিশোর এই হিন্দু সমাজের কাছেও তার প্রতিবেশীর আটপৌরে পারিবারিক জীবনের তথ্যচিত্র রচনা করবার প্রয়াস পেয়েছেন। আর এই জানার অনিবার্যতা তিনি ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। হিন্দু আর মুসলমান বাঙালির এই যে বিভাজন তা গৌরকিশোর দেখিয়েছেন, কত নড়বড়ে, কত অলীক, কত মিথ্যা অনুমানের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এবং সেখানে বিভেদ সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, সেই সংস্কারের মূলেও যেন গৌরকিশোর আঘাত দিতে চেয়েছেন।

ট্রিলজির শেষ উপন্যাস 'প্রতিবেশী' দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে পঞ্চাশটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হয়েছিল পঁচিশে জানুয়ারী উনিশশো বিরানব্বই সালে। প্রথম খণ্ডের কাহিনি শুরু হয়েছিল উনিশশো বাইশ সাল দিয়ে। ট্রিলজির চূড়ান্ত পর্বটি শেষ হয়েছিল উনিশশো ছেচল্লিশ সালের ষোলই আগষ্টে এসে। গৌরী আইয়ুব ভূমিকায় বলেছেন, 'একই বিষয়ের' ঐতিহাসিক পরিণতি প্রথম খণ্ডের কাহিনি দ্বিতীয় খণ্ডে কিছুটা অনুসৃত। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসের গৌণ চরিত্র ফটিক মিঞা ওরফে সফিকুল মোল্লা 'প্রেম নেই' উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র। কিন্তু 'প্রতিবেশীতে' মুখ্য চরিত্র দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত অমিতা।

অমিতার ট্র্যাজিক আর্তনাদে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন লেখক। হয়তো এটাও প্রতীক চিরবিচ্ছেদের। এই উপমহাদেশে মহাযুদ্ধের পর প্রশান্তি নয়, বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় শেষ হল ট্রিলজি। জল পড়ে পাতা নড়ে, প্রেম নেই এবং প্রতিবেশী ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির সঙ্গে ব্যক্তির ট্র্যাজেডির এক নিপুণ মিলন। বাংলদেশের উপন্যাসে এর পরিচয় থাকলেও পশ্চিমবাংলার উপন্যাসে এ চিত্র দুর্লভ। ক্যানসার রোগে আক্রান্ত

ফুলকি ওরফে অমিতা। প্রথম দুখণ্ডের কাহিনিস্থল ছিল পূর্ববঙ্গের যশোর কুমিল্লা অঞ্চলে গ্রামজীবন। তৃতীয় খণ্ডের পটভূমি কলকাতা। নিঃসঙ্গ রোগাক্রান্ত অমিতা স্মৃতিচারণায় ফিরে গেছে তার ব্যক্তিজীবনে। স্মৃতি এবং বর্তমান সত্তার আলো-ছায়ার ঠাস বুনোনে এর কাহিনি গ্রথিত। গৌরী আইয়ুব ভূমিকায় লিখেছেন, "যা গোড়ায় ছিল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘাত সেটাই কী করে ক্রমে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে এবং শেষপর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পৌঁছে দেশকে খণ্ড খণ্ড করল তারই বস্তুনিষ্ঠ কিন্তু সহৃদয় চিত্রণ।"

অমিতা ও শামিম ভালবেসেছিল পরস্পরকে। দুটি শিক্ষিত মনের মানুষ তাদের বুদ্ধি ও আবেগ দিয়ে পরস্পরকে শরীরে ও মনে গ্রহণ করেছিল; কিন্তু ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির ছায়া পড়ল তাদের ব্যক্তি জীবনেও। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তারা। যেমন ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল হিন্দু ও মুসলিম মানস। বাঙালি বিভক্ত হয়ে গেল হিন্দু বাঙালি ও মুসলিম বাঙালিতে। ভাগ হয়ে গেল ভারতবর্ষ। গৌরকিশোর অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের, সামাজিক মতান্তরের এবং ব্যক্তিমানসের এক নিবিড় গ্রন্থিবন্ধন করেছেন। এই সম্পৃক্তি একই সঙ্গে বাস্তব ও প্রতীকী। উপন্যাসে রাজনৈতিক মত ও পথের হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের গভীর বিশ্লেষণ রয়েছে। কিন্তু এই তর্কবিতর্ক উপন্যাসের গতিকে মন্থর করেনি। ক্লান্তিকর মনে হয়নি। কয়েকশত বৎসর ধরে পাশাপাশি বাস করেও হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের প্রতিবেশী হয়ে উঠতে পারল না। লেখক এর জন্য দায়ী করেছেন এই উপমহাদেশের মৌলবাদী রাজনীতিকে।

তিনটি উপন্যাসেই বিশেষত 'প্রেম নেই' উপনাসে মুসলিম পারিবারিক জীবনের তো তন্নিষ্ঠ চিত্র এঁকেছেন দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তার প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গের বাংলা উপন্যাসে মেলে না। যশোর খুলনা অঞ্চলের উপভাষার ব্যবহারেও লেখকের দক্ষতা তুলনাহীন। যাইহোক, হিন্দু বাঙালি ও মুসলিম বাঙালির ক্রমবিচ্ছন্নতার ইতিবৃত্ত এই ত্রয়ী উপন্যাস।